রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" : একটি রাজনৈতিক পাঠ

কঙ্কন সরকার

রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা এবং রক্তকরবী

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশ। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, তাঁকে বাদ দিয়ে বাংলা তথা বাঙালির, ভারতীয় সংস্কৃতির কোনো আলোচনা সম্পন্ন হতে পারে না। এবং দীনেশ দাস লিখেছিলেন, 'তোমার পায়ের পাতা, সবখানেতেই পাতা কোনখানে রাখব প্রণাম' (প্রণামি)। গদ্য বা কবিতা যাই হোক না কেন, বক্তব্যের মধ্যে কোনো বাহুল্য বা কল্পনার স্থান নেই। যথার্থই রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র প্রতিভার আদি-অন্তের হদিশ পাওয়া বড়ই কঠিন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, গীতিকার, শিক্ষাবিদ, সাংগ্রহক দেশপ্রেমিক জমিদার প্রতিপালক সামাজের উদ্গাতা ... ঠিক কী নয়! রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তোমার তুলনা তুমি! পৃথিবীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এরকম ধুরন্ধর বহুবর্ণময় সম্পূর্ণ মানুষ খুব কমই আছে। এরকম একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সৃজনকর্মের বিচার-বিশ্লেষণ প্রচলিত একমাত্রিক মানদণ্ডে করতে যাওয়া নিতান্তই মূর্খতা। অন্যদিকে, সমালোচনায় আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা এতটাই ব্যাপক যে এ নিয়ে খুব বেশি কথা বলা চলে না। আমরা প্রায়শই বিদেশির চোখে এবং ভীনদেশি মানদণ্ডে আমাদের সমস্ত বিষয়-আশয় বিচার-বিশ্লেষণে অভ্যস্ত। ভিনদেশির শ্রেণিগত অবস্থান, তাদের দেশীয় উদ্যোগে ও প্রয়োজনে গড়ে ওঠা মানদণ্ড যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের দেশ ও সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত — এ কথা ভুলে যাই। ফলে, অভ্যস্ত প্রচলিত মানদণ্ডে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুধাবন করতে না পারলেই আমরা তাকে দুর্বোধ্য ও নির্মাণ যথাযথ হয়নি বলে দেগে দিই। ভাবি না, সব জিনিসের আলাদা আলাদা প্রেক্ষিত, নির্মাণকলা আছে; ভাবি না, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সৃষ্টিধর সব মানুষকে একই ধাঁচে ফেলে একইরকম বিচার চলে না। মনে রাখা দরকার, বাতিল হয়ে যাওয়া রবীন্দ্র কাব্যাদর্শকে প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা হয়েছিল; কিন্তু শেষে তিনি নিজে পালের হাওয়া কেড়ে নিয়ে আধুনিকতম কবিদের বিস্মিত করে দিয়েছিলেন 'পুনশ্চ' ইত্যাদি শেষ বয়সের কাব্যগ্রন্থগুলিতে। আধুনিকতম কবিরা সে কথা অকপটে স্বীকারও করেছিলেন। একইভাবে, ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও বিষয় হিসেবে এক সর্বাধুনিক নারীর ছাঁদও নির্মাণ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর দু'বছর আগে (ল্যাবরেটরির নায়িকা দ্রষ্টব্য)। তাঁর শেষ জীবনের পরম আশ্রয় রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং চিত্রকলা সেদিন গোটা বিশ্বকে যেভাবে আলোড়িত এবং আলোকিত করেছিল, তা আজও আমাদের মুগ্ধকর জীবনযাপনের নিত্যসঙ্গী, একান্ত আশ্রয়। তাই আজও তাঁকে নিয়ে, তাঁর সৃষ্টির অনন্যতা এবং বিশালত্ব নিয়ে আমাদের অনুধাবন ও অনুসন্ধানের অন্ত নেই। এই যে তাঁর এবং তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের অনন্যতা (Uniqueness) নিয়ে সহজ বিশেষণ বা সরলতর বিশ্লেষণ একেবারেই অচল। স্বভাবতই আমাদের আরও একটু সাবধানী হতে হয়। তাঁর সেই বহুস্তরীয় বহুবর্ণময় সৃষ্টির ভিতর ও বাহির, আদান-প্রদানের মধ্যে অর্জিত লব্ধির ক্রমপর্যায় অনুসারে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে হয় বারবার। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী এবং রক্তকরবীর রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আলোচনার আগে হয়তো এটুকু আমাদের মনে রাখা একান্ত জরুরি।

Society Language and Culture

রক্তকরবীঃ কাহিনী বিন্যাস ও সামাজিক স্থিতি

শম্ভু মিত্রকে রক্তকরবী প্রসঙ্গে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ি বলেছিলেন, 'এটি হাফ ফিলজফি, হাফ থিয়োলজি, হাফ পলিটিক্স।' নাট্যাচার্য যথার্থই বলেছিলেন। আসলে রবীন্দ্রনাটকের তত্ত্বমাত্রিকতা তাঁর নজর কেড়েছিল। এবং সে জন্য রবীন্দ্রনাটক, বিশেষত রক্তকরবী, মঞ্চস্থ করা কঠিন বলে তিনি মনে করেছিলেন। অবশ্য 'বহুরূপী' তাঁর সে ভুল ভেঙেছিল এবং তিনি সানন্দে তার স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গ অবান্তর। যে কোনো নাটকে তো দর্শন আছেই, নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাঁর রূপায়ণ সংঘটিত হয়। এবং এটা মূলত নাট্যকারের জীবনাদর্শ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে রক্তকরবী নাটকে তিনি রামায়ণের কাহিনীকে একইসঙ্গে গ্রহণ, বর্জন এবং অতিক্রম করে একটি আধুনিককালের জীবনীনাট্য সৃজন করেছেন। তাই তিনি প্রাচীন অলৌকিক মিথ কাহিনী, রাবণের সীতাহরণের কাহিনীটি একটু ভিন্নভাবে গ্রহণ করেছেন এবং অতিপ্রাকৃতকে অত্যন্ত প্রতীকীভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে আধুনিক জীবন ও যুগের উপযোগী একটি বিশ্বস্ত কাহিনী নাটকে গ্রহণ করা যায়। তাই তাঁর 'রাজা' বর্ণনায় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন একটি মূর্তি কল্পনায় কোনো অসুবিধা হয়নি (দেখলুম মানুষ কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার। বাহুদুটো কোন দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল। মনে হল যেন রামায়ণ মহাভারতের থেকে নেমে এসেছে কেউ। ৩৭১ পৃষ্ঠা)। আবার আধুনিক যুগের তাড়নায় তিনি রামায়ণের কাহিনী এবং চরিত্রগুলিকে অতিক্রম করে গেছেন সহজাত দক্ষতায়। এখানে রাম নেই, সীতা নেই; আছে রাজা, সর্দার, নন্দিনী, রঞ্জন; আছে তাদের অনুশ্রিত ব্যবস্থাপনা (System) এবং তার বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মরণপণ লড়াই। সে জন্য সাদৃশ্যমূলক ঘটনাকে কিম্বা চরিত্রকে স্বনামে এখানে তিনি উপস্থিত করেননি; আধুনিক যুগের প্রেরণায় তাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিস্ফুট করেছেন। অভিভাষণের মঞ্চে তিনি বলেছেনঃ আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদি ছবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত-পা-মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালায় রাজা যে সেই____ যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে (পৃষ্ঠা ৭১৫)।

Society Language and Culture

এইভাবে নাটকের কাহিনী বিন্যাসে, চিত্রে, চরিত্রে এবং গূঢ় ঘটনা বিন্যাসে প্রাচীন অলৌকিক রসের মিথ কাহিনীর আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যবহারসম্পন্ন করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ। যা এক অর্থে এ যুগের সমস্যা, অন্যভাবে তা সর্বকালেরও। এভাবে দেখলে রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতাকে স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়। তিনি একইসঙ্গে সমকাল ও সর্বকালকে স্পর্শ করে সময়ের মধ্যে ভূস্তরীয় যাতায়াতকে সহজতর করে তুলেছেন এই নাটকে। তাঁর এই সাংকেতিকতা বুঝে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। এ যুগের রাজা বা শাসকেরা প্রকৃতি লুণ্ঠনে পরিব্যাপ্ত। প্রকৃতি ও মানবসমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে চূড়ান্তভাবে ব্যবহার (?) করে তারা ক্রমে প্রচণ্ড পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছেন। তাদের পীড়নে চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত মানুষ ও তার প্রকৃতি। বিপন্ন এই সমাজ ও সভ্যতা কি চিরতরে লুপ্ত হবে নাকি রঞ্জন-নন্দিনীর প্রবর্তনায় আবারও মানবসভ্যতা রক্ষা পাবে?

এই প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ একইসঙ্গে উত্থাপন করেছেন এবং উত্তর সন্ধান করেছেন তাঁর এই অবিস্মরনীয় নাট্য পরিক্রমায়। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সভ্যতার সংকটে শুভ মানবিক শক্তির জয়কেই নিশ্চিত করেছেন রক্তকরবী'তে। সে জন্য শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ শুভ মানবিকবোধেরই প্রত্যাশা করেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথ এখানে রাবণ ও

বিভীষণকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করেননি; তাদের একই শরীরে স্থাপন করে মানুষের মধ্যে দুই শক্তির বিদ্যামানতাকে প্রকটিত করেছেন। এখানে তাঁর আধুনিক যুক্তিনিষ্ঠ মন ও মানসিকতা, মানবিক সত্ত্বার অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিকতাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ, ভালো-মন্দ উভয়ই একসঙ্গে বিরাজিত, পরিবেশ পরিস্থিতির বিশেষে তার বিকাশ ও বিনাশ সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ, তিনি কার্ল মার্কস কথিত Being determines consciousness বা অস্তিত্বই চেতনাকে নির্ধারিত করে -- একথা এই নাটকের কাহিনী এবং চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে বিকশিত করেছেন।

রক্তকরবীর দুই সমাজঃ রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত

স্মরণে রাখা দরকার যে রক্তকরবী রচনাকালে (১৯২৪) রবীন্দ্রনাথ মাত্র দু'টি সমাজের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একটি ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বা সভ্যতার রূপ, অন্যটি জার্মানি, আমেরিকা, ব্রিটেন-সহ ইউরোপীয় শিল্পোন্নত ধনবাদী সমাজ বা সভ্যতার রূপ। তখনও পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের নবোদ্ভূত রূপটি প্রত্যক্ষ করেননি (১৯৩০)। তাই দু'ধরনের সামাজিক ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার মধ্যে তুলনা-প্রতিতুলনায় তিনি প্রথমটিকে গ্রহণ করেছিলেন। ঔপনিবেশিক পরাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদী যন্ত্রসভ্যতার অমানবিক নির্যাতনে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। যন্ত্রসভ্যতার নির্মমতায়, ব্রিটিশের শোষণ, লুণ্ঠন, হরণের বিরুদ্ধে তিনি বারংবার অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং বারংবার তিনি মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষ্যে যৌথ নাগরিকসত্ত্বা এবং প্রতিপালক সমাজের পক্ষে দৃঢ়ভাবে মতামত দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রবহমান কর্ষণজীবী ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতাকে শুধুমাত্র আর্থিকভাবে লুণ্ঠন করেছে তাই নয়, দেশের শ্রমজীবী অধিকাংশ মানুষকে ধনেপ্রাণে-শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নিঃস্ব এবং সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। তিনি আমেরিকা-জার্মানির মতো অতি উন্নত পুঁজিবাদী যন্ত্রনির্ভর দেশগুলিতে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করেছেন, সেখানে মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বা বলে কিছুই আর অবিশিষ্ট নেই, সামাজিক সত্ত্বাও বিপর্যস্ত। মানুষ ক্রমেই যন্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে যান্ত্রিকতার গতানুগতিকতায় শৃঙ্খলিত, তুচ্ছ, নগন্য সংখ্যায় রূপান্তরিত। রক্তকরবী নাটকে তাঁর এই নিজস্বতা চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। বিশু এখানে ৬৯ঙ, ফাগুলাল ৪৭ফ, মোড়ল ৭১ট এবং পাড়াগুলি ট-ঠ ইত্যাদি। কয়েদখানার অপরাধীর মতো এরা ক্রমে ক্রমে আত্মপরিচয় হারিয়ে কেবলই নগন্য সংখ্যায় রূপান্তরিত। এই যান্ত্রিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী যৌথসত্ত্বায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের পক্ষ্যে মান্যতা দেওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন। একইরকমভাবে, তিনি অন্যত্র ইউরোপীয় চেতনাজাত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নির্মমতাকেও মান্যতা দেননি। তিনি একইসঙ্গে মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্ত্বা ও সামাজিক সত্ত্বার বিকাশে আস্থাবান ছিলেন। মানবিক সত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি অসামান্য মুক্ত, স্বাধীন, সর্বার্থ, সঠিক ব্যবস্থাপনা গড়েও তুলেছিলেন, সে প্রসঙ্গ অবশ্য আলাদা।

Society Language and Culture

বহুমুখী দ্বন্দ্বের শিল্পিত প্রকাশ এবং রক্তকরবীর নিশ্চিত অভিমুখ

১৯২৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর 'পশ্চিমী যাত্রীর ডায়রি'-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ নারীর ভিতর দিয়া বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাঁধা পায়, তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের

মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে ঘরে আসছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টায়, তাড়নায় প্রসবের মাধুর্য্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনারে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে আঘাতের চেয়ে আনন্দের দান বেশি, ভুলেছে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুসকে দাস করে রাখার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

এমন সময়ে নন্দিনী এল, অর্থাৎ নারী এল, প্রাণের আবেদন এসে পড়িল যন্ত্রের উপর, প্রেমের বেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারী শক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে (System) ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধা মুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ...আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপক নাটক নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, ভালো-মন্দ নিয়ে বিরোধের কথা, মানুষের মহিমা উদ্বুদ্ধ করে ধরার জন্যই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ একদিকে যেমন ব্যক্তিগত মানুষের, আরেক দিকে শ্রেণিগত মানুষের, রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আরেক দিকে মানুষের শ্রেণিগত রূপ। আমার নাটকও একইকালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণির। ...চারিদিকে পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। (৭১৬ পৃষ্ঠা)

সুতরাং, রক্তকরবী পুরুষ ও নারীর এই দুই ভিন্নমুখী স্বভাবধর্মের নাটক কেবলমাত্র নয়, তা একইসঙ্গে পীড়নের ভিতর দিয়ে...ব্যক্তিগত মানুষ ও 'মানুষগত শ্রেণির' দ্বন্দ্বমুখর রূপের চরম প্রকাশ। এবং এই নাটকের শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ আরও একটি শ্রেণি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, তা হল 'আমরা' এবং 'ওরা'। রবীন্দ্রনাথ এটা খুব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেননি, তবে বুঝে নিতে কোনোরূপ অসুবিধা হয়নি যে তারা মালিকশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে এবং শোষক বা মালিকশ্রেণি সর্বদাই শাসনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রক বা এই কায়েমি স্বার্থবাহী ব্যবস্থাপনার মূল সংগঠক। আমাদের সমাজে এই পরস্পরবিরোধী এবং ভিন্ন ভিন্ন অভিমুখে পরিচালিত দুই বিবাদমান শ্রেণির কথা রবীন্দ্রনাথ বারংবার এই নাটকে উল্লেখ করেছেন। রক্তকরবীর প্রথম দিকে আমরা দেখি বিশু চন্দ্রাকে বলছেঃ "কথা আমরা বলি, মানে যে করে ওরা। কাজেই কোন কথার টিকে কোন চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।" (৩৬৭পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ একদল মানুষ তাদের শান্তিপ্রিয়, যূথবদ্ধ, পরিশ্রমী জীবনযাপনে স্বাভাবিক নিয়মেই কথা বলে। শাসকেরা লোভ আর ক্ষমতা রক্ষার তাগিদে তার ভিন্ন ভিন্ন হস্তান্তর করে থাকে। কোনো ভালো কথাই তাদের আর ভালো লাগে না, সব কথাতেই তারা অস্বাভাবিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে নিজেদের কায়েমি স্বার্থকে অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। অর্থাৎ, সমাজের উর্ধতন স্তরের মানুষ হিসাবে তারা অধস্তন স্তরের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে; মানুষের ঐক্যে তাদের যে বড় ভয়! ভাঙো এবং শাসন করো -- এই নীতিতেই তারা বড়ো বেশি আস্থাশীল। সাধারণের একে অপরকে জড়িয়ে বেঁচে থাকা ও তাদের ঐক্যকে তারা সেজন্য ভয় পায়। যন্ত্রের শক্তিতে, ব্যবস্থাপনার শক্তিতে, ক্ষমতার দম্ভে তারা মানুষ ও প্রকৃতিকে লুঠ করে নিতে বেপরোয়া। মুনাফার স্ফীত পাহাড়ে দৈত্যাকার স্বার্থপর অমানুষ হয়েও উঠতে তাদের কোনো কষ্ট নেই। রবীন্দ্রনাথ এই দুই শ্রেণির দ্বন্দ্বকে চমৎকারভাবে রক্তকরবী নাটকে উল্লেখ করেছেন। বিকশিত হতে দিয়েছেন এবং শেষে রঞ্জনের আবির্ভাবের মধ্য

Society Language and Culture

দিয়ে শ্রমজীবী সর্বহারা মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংগ্রামের প্রচেষ্টাকে (বিপ্লব প্রচেষ্টা) জয়যুক্ত হওয়ার সংকেতও রেখেছেন। শোষক ও শাষকযন্ত্রের চরম আঘাতে রঞ্জনের মৃত্যু হলেও – বিপ্লবীর মৃত্যুতে যে বিপ্লবের মৃত্যু সংঘটিত হয় না- এই চিরায়ত বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক সত্যকে রবীন্দ্রনাথ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন এই নাটকে। তাই রঞ্জন শহিদের মৃত্যুবরণ করে শেষপর্যন্ত বিপ্লবের জয়ধ্বজাকে উড্ডীন করে দিয়ে গেলেন। অচল ব্যবস্থাপনার প্রতি বিরূপ হয়ে শেষে রাজারও চিত্ত টললো, তিনি বৈপ্লবিক নারীশক্তি নন্দিনীর প্রভাবে উপপ্লবে হাজির হয়ে নতুন জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তনে সামিল হলেন। এই ঘটনাক্রমের মধ্যে কি ১৯১৭ সালের সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের কোনো ছায়া প্রতিফলিত হচ্ছে না? ১৯১৭ সালে কৃষিপ্রধান সামন্ততান্ত্রিক অনগ্রসর একটি দেশ- সোভিয়েত রাশিয়ার দেশ- সোভিয়েত রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমজীবী মানুষের যৌথ নেতৃত্বে যে নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল তার প্রভাব কি একেবারেই রবীন্দ্রনাথের মনে পড়েনি? সাত বছর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন রক্তকরবী রচনা করেছেন সেই ঘটনাক্রমের দ্বারা যে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি, এমন কথা কে বলতে পারে! বিশেষত, তাঁরই পরিবারের একজন সদস্য যখন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল তখন। রবীন্দ্রনাথ যে শ্রেণিসচেতন ছিলেন এবং সদাসর্বদাই সমকালীন সমস্ত ঘটনায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন একথা আমরা সকলেই জানি, তবে তিনি তাঁর নিজের মতো করে স্বতন্ত্র পথে যাত্রা করেছেন।

রক্তকরবী নাটকে যেখানে গোঁসাইয়ের আবির্ভাব ঘটছে সেই অংশটি যদি স্মরণ করি তাহলে দেখব, তিনি কি ভয়ঙ্কর সমাজ ও শ্রেণিসচেতন। তিনি গোঁসাইয়ের মুখ দিয়ে বলেছেন, "এই এঁদের কথা বলছ? আহা এরা তো স্বয়ং কূর্ম-অবতার। বোঝার নীচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিকে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা, একবার ঠাউরে দেখো, যে মুখে নামকীর্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা; শরীর খচিত হল যে নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। এ কি কম কথা! আশীর্বাদ করি, সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তাহলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হালকা হয়ে যাক। হরিনাম "আদাবন্তে চ মধ্যে চ।"- আত্মপ্রকাশেই চমৎকার উপস্থাপনা, যেন বিনয়ের অবতার। সে-ই পরে সর্দারকে জানাচ্ছে, "তবু আরো কটা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা নাহংকারাত পর রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটা দমন হয়, তারপরে আমাদের পালা।"

Society Language and Culture

ফৌজের ব্যবহার সম্পর্কে ধর্মের ধ্বজাধ্বারীরা কী পরিমাণ সচেতন এই বাক্যবন্ধের মধ্য দিয়ে সেটা খুবই স্পষ্ট। এবং তাদের ভূমিকা নির্মানের সুযোগ প্রকৃতপক্ষে কখন ঘটবে সেটাও। শাসকশ্রেণির স্বার্থে কিভাবে ধর্ম, কিভাবে সেনাবাহিনী, কিভাবে সংস্কৃতির ব্যবহার সংঘটিত হয়, কিভাবে রাষ্ট্র হয়ে ওঠে সর্বময় কর্তা কিম্বা রাষ্ট্রপ্রধানই হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রের একমাত্র ত্রাতা। রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী নাটকে তা বারংবার বিবৃত করেছেন আশ্চর্য দক্ষতায়। কে বলে তিনি মার্কসের শ্রেণিদ্বন্দ্বের তত্ত্ব, মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, শোষণ, পুঁজি, আধিপত্যবাদ, ধর্মব্যবসায়ী, রাষ্ট্র – এসব কিছুই জানেন না! কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র ও তার সংস্কৃতি কিভাবে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে শোষণ ও শাসনের অনুকূলে নীরবে সম্মতি আদায় করে নেয় – রক্তকরবীতে রবীন্দ্রনাথ রূপকের মাধ্যমে অকপটে বিবৃত করেছেন।

ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে কিভাবে ধর্মের ধ্বজাধারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থে, মালিকের স্বার্থে ব্যবহার করে, কিভাবে ধর্মের আফিম শ্রমজীবী মানুষকে বৃহত্তর জীবনসংগ্রাম থেকে বিচ্যুত করে এসব ইতিবৃত্ত নিঃসঙ্কোচে

রবীন্দ্রনাথ বিবৃত করেছেন। অন্যদিকে, ধর্মের ক্ষেত্রে যে আড়ম্বরতার যোগাযোগ প্রবল সেটাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি (৩৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আবার ধর্মকে ব্যবহার করে বা না করে মেয়েদের কর্মক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্তও রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে উপস্থিত করেছেন (৩৬৮ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের এই লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানও দৃঢ় করেছেন এই নাটকে।

শুধু ধর্ম কেন, মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির যে একেবারে গায়ে গায়ে শাসকশ্রেণির স্বার্থে একে অপরের পরিপূরক হয়ে অবস্থান করে সেটাও এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন (৩৬৩ পৃষ্ঠা)। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – "যে রশিতে এই চাবুক তৈরী সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরী হয়" (৩৮৪ পৃষ্ঠা)। ধনবাদী সমাজের শাসক এবং তাঁর শাসনযন্ত্রের সমস্ত কিছুর সঙ্গে যে এতো নিবিড় সমষ্টি, তাদের পারস্পরিক কার্যকারিতা সমস্তই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি।

অন্যদিকে, অভাবী মানুষের মধ্যে নিজেদের সংকট ও অস্তিত্ব ভুলে কিভাবে তাদেরই অগোচরে 'সোনার নেশা' সংক্রমিত হয়, তারাও কিভাবে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে নিজেদের মধ্যে শাসকশ্রেণির স্বভাবে মুগ্ধ হয় এবং নিজ সম্পদ বৃদ্ধিতে যত্নবান হয়ে ওঠে সেকথাও রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে চন্দ্রার উদ্দেশ্যে বিশুর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। -" আমি বলছি 'হ্যাঁ' এই যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরো চার ঘণ্টা যোগ করে খেটে মরে তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জানো না, অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে ভিতরে ওকে চাবুক মারে যে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া" (৩৬৬ পৃষ্ঠা)। এইজন্য খনিশ্রমিক ফাগুলাল তাদের জীবনসংগ্রামের পাশাপাশি মালিকশ্রেণির লুব্ধক সংস্কৃতিকে নিজের অজান্তে তার নিজের জীবনের অন্তর্গত করে নেয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে, আধিপত্যবাদী তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন কি না আমাদের জানা নেই। তবে তিনি যে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সচেতন ছিলেন এই সংলাপের মধ্যে তা সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত।

Society Language and Culture

সুতরাং, মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ শ্রেণিসংগ্রাম, কিংবা অন্যান্য মার্কসীয় তত্ত্ব বিশ্বাস করতেন কি না তা অবান্তর। তিনি যে তাঁর যুগের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন এবং তাঁর সমকালে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, রাষ্ট্র-সমাজনীতি, দেশ ও জনগণ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন এবং সক্রিয় ছিলেন এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও সংশয় নেই। সেজন্য আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর সাংবাদিকদের বলেছিলেন, এতক্ষণ মনেই ছিল না যে আমি একজন কবির সঙ্গে কথা বলছিলাম।

মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ এবং

রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদী। মানুষ ও মানবতাবাদকে কেন্দ্র করেই তাঁর নিজস্ব জীবন ও সৃষ্টিসম্ভার আবর্তিত। কাজেই তাঁর শিল্পিত মনুষ্যত্ব এবং মানবতাবাদকে স্মরণে রেখেই আমাদের তাঁর সৃষ্টি, স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব -- সমস্তই বিচার করা একান্ত জরুরি। কিন্তু আমরা সহজেই লক্ষ্য করব যে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের মধ্যে শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব নিশ্চিত নিহিত আছে। তবে মার্কসবাদী সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন স্পষ্ট বলেন, 'কেড়ে খাওনি কেন'? তিনি অবশ্য তেমন স্পষ্ট করে বলেন না; তবে বুঝিয়ে দেন। এরকমই একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পাই অধ্যাপক ও নন্দিনীর কথোপকথনের মধ্যে। মনুষ্যত্বের নতুনতর সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ এখানে উচ্চারণ করেন। রবীন্দ্রনাথের

বিবেচনায় রাজাও ক্রীড়নক। তাঁরই নির্মিত সর্দারচক্রের বা ব্যবস্থাপনার হাতে বন্দী একজন মানুষ এবং সর্দার হচ্ছে দমন-পীড়ন-শোসনের মূল সহায়ক, ধনবাদী রাষ্ট্রের একমাত্র কর্ম সম্পাদনের উপায়। সর্দার প্রসঙ্গে নন্দিনী বলছে,

"নন্দিনীঃ দিনরাত এই মানুষধরা ফাঁদের খবরদারী করে এরা একটুও কি ভালো থাকে?

অধ্যাপকঃ ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এতো ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে যে লাখো-লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে? জাল তাই বেড়েই চলেছে। অদ্বের যে থাকতেই হবে।

নন্দিনীঃ থাকতেই হবে? মানুষ হয়ে থাকবার জন্য যদি মরতেই হয় তাতেই বা দোষ কি!

অধ্যাপকঃ আবারও সেই রাগ! সেই রক্তকরবীর ঝঙ্কার? খুব মধুর, তবুও যা সত্য তা সত্য। থাকবার জন্য মরতে হবে, একথা যারা বলে তারাই থাকে। তোমরা বলো এতে মনুষ্যত্বের ত্রুটি হয়, রাগের মাথায় ভুলে যাও এইটেই মনুষ্যত্ব।" (৩৮০ পৃষ্ঠা)

পরিশেষে

এমন অন্তরঙ্গভাবে যদি কাহিনী, সংলাপ, চরিত্রচিত্রণ, ক্লাইম্যাক্স ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করি তাহলে আমরা সহজেই অনুধাবন করব যে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথাই বলে যান 'অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি।' আমরা শুধু নীরবে প্রত্যক্ষ করি তাঁর স্বতন্ত্রতা, তাঁর সৃষ্টির বিশালত্ব এবং প্রকৃত মানবতাবাদের প্রবল উত্থান। শ্রমজীবী সমাজের অধিকাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা গড়ার সংগ্রাম শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রাণের স্পর্শে নতুন করে জেগে ওঠে, অন্যরকমভাবে আমাদের প্রেরণা জাগায়, সেটা আমাদের চেনাজানা পরিচিত পথ নাও হতে পারে। সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের স্বার্থে বারবার রবীন্দ্রনাথকে আমরা তাঁর স্বাধীন মতামত দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের কখনোই একরৈখিক রাজনৈতিক সংকীর্ণতা ছিল না। কখনো তিনি সরল ডান-বাম, সহিংস-অহিংস রাজনীতির প্রেরণায় আবদ্ধ হননি। বৃহত্তর মানবকল্যাণের প্রেরণাই ছিল তাঁর সমস্ত কাজের লক্ষ্য। কিন্তু ধনবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা যে আমাদের যূথবদ্ধ স্বাভাবিক জীবন ও জীবিকাকে ধ্বংস করতে উদ্যত সেকথা তিনি কখনোই ভোলেননি। যুদ্ধ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্টঃ "আসল সত্য কথাটা হচ্ছে - বিরোধ-সংঘর্ষ ও রাজ্যজয়ের ইতিহাস। এটা হচ্ছে যেন একদল মৃগয়াক্ষেত্রের প্রসারের জন্য নিজেদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে।" (জার্মানীতে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ১৯১৬)

Society Language and Culture

আমেরিকা-জার্মানিতে প্রদত্ত ভাষণগুলি সংকলিত করে Nationalism বলে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তিনি এক জায়গায় বলছেনঃ "The commercialism with its barbarity of ugly decorations is a terrible menace to all humanity, because it is setting up the ideal of power over perfection. It is making the cult of self-seeking exult in its naked shamelessness." (*On Nationalism, Sahitya Academy in Rabindranath English Writings, S.K. Das ed. 1916*) এখানে যে রাজনীতি আছে তা প্রত্যক্ষ শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীভুক্ত, একথা বুঝতে আমাদের কোনোরূপ অসুবিধা হয় না। জাতিরাষ্ট্রের ভ্রান্ত তত্ত্ব, মহাযুদ্ধের তাণ্ডব, শিল্পোন্নত ধনবাদী শোষণনির্ভর সমাজব্যবস্থাপনা যে মানবসভ্যতার

সংকটকে দীর্ঘায়িত করেছে একথা রবীন্দ্রনাথ শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি ভ্রমণের সময় থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। সুতরাং, তাঁর এই রাজনৈতিক চেতনা যে পরবর্তীকালে রক্তকরবী রচনাকে প্রভাবিত করবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই রাজনৈতিক পাঠ আমরা রক্তকরবী নাটকের পরতে পরতে বলি, আমরা স্পর্শ করি এবং অন্যরকম একটা নান্দনিক স্তরে নিজেদের উত্তীর্ণ করে নিই। অ্যারিস্টটল তো সেই কবেই বলে গেছেন, 'মানুষ রাজনৈতিক জীব' (Man is by nature a political animal – Aristotle)।

রাষ্ট্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত খুব স্পষ্ট। "রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান, সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। 'স্বদেশীসমাজ' – এ রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন। এবং তিনি এও বলেছেন যে "পাশ্চাত্যরাজার শাসনে এইখানেই ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। আমাদের দেশের প্রত্যন্ত গ্রামপ্রদেশে পরিব্যাপ্ত তাঁর সামাজিক স্বরূপকে রাজশাসন অধিকার করায়...।" এই বিপরীতমুখী আঘাতে আমাদের দেশ টুকরো টুকরো। তাই বলি 'আমরা হয়ে নিজেদের সত্ত্বা ও সংকটকে দীর্ঘায়িত করেছে। এ থেকে মুক্তির জন্য বিপ্লব ছাড়া পরিত্রাণ নেই – রক্তকরবী নাটকে রবীন্দ্রনাথ সেদিকেই আমাদের অভিমুখ নির্ধারিত করে গেছেন।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

১। রবীন্দ্ররচনাবলী সুলভ সংস্করণ, ১৩৯৫। অষ্টম খণ্ড।

২। On Nationalism in Rabindranath English Writings edited by S.K. das, Sahitya Academy, 1916.

৩। মিরান্দা (বিশেষ রক্তকরবী সংখ্যা)। জানুয়ারি ২০০৩

Society Language and Culture

(Kankan Sarkar is an Author, Poet and Cultural Activist of Bengal)